নির্বাচনকেন্দ্রিক
মানবাধিকার সুরক্ষা বিষয়ক
নির্দেশিকা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

সম্পাদনায়
ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
মো: সেলিম রেজা, সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০২৩

প্রকাশনায়
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ
বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা)
৭-৯, কারওয়ান বাজার, ঢাকা- ১২১৫

হেল্পলাইন: **১৬১০৮**
e-mail : **info@nhrc.org.bd**
Website : **www.nhrc.org.bd**

নির্বাচনকেন্দ্রিক মানবাধিকার সুরক্ষা বিষয়ক নির্দেশিকা

১. ভূমিকা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি স্বাধীন সংবিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও এখতিয়ার নির্ধারিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলে উল্লিখিত মানবাধিকার মানদন্ডের যেগুলো বাংলাদেশ অনুসমর্থন/অনুস্বাক্ষর করেছে তা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাজের আওতাধীন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে একটি মানবাধিকার সংস্কৃতি গড়ে তোলা যেখানে সকল মানুষের সম অধিকার, ন্যায়বিচার ও মর্যাদা সুরক্ষিত হবে। এরই অংশ হিসেবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার সুরক্ষার পাশাপাশি রাজনৈতিক সহনশীলতা এবং শান্তিপূর্ন নির্বাচনী পরিবেশ বজায় রাখতে নির্বাচনপূর্ব, নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন পরবর্তী সময়ে ধারাবাহিক ও সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। কমিশন নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান, নির্বাচনী প্রার্থী, নাগরিক ও ভোটারসহ সকলের অধিকার, দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি এবং জাতিগত, ধর্মীয় ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার সুরক্ষা ও মর্যাদাপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

২. গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের সর্বজনীন স্বীকৃত ধারনা

গণতান্ত্রিক পরিবেশ মানবাধিকার চর্চা ও সুরক্ষার জন্য অপরিহার্য । সেজন্য গণতন্ত্রকে বিশ্বব্যাপী মানুষের অধিকার চর্চা ও সুরক্ষার জন্য সর্বজনীন মডেল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। গণতন্ত্র মানুষের মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক সম্প্রীতি, জাতীয় ঐক্য এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন করে বিধায় এটি জাতিসংঘ কর্তৃক রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ও আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

জাতিসংঘের সর্বজনীন ঘোষণা, ১৯৪৮ এর অনুচ্ছেদ-১ এ সকলের সম-মর্যাদা এবং অনুচ্ছেদ-২ এ বৈষম্যহীনভাবে সকলের স্বাধীনতা ও সম-অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এই ঘোষনার অনুচ্ছেদ-২১ এ বলা হয়েছে যে - প্রত্যক্ষভাবে বা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের শাসন পরিচালনায় প্রত্যেকের অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। অন্যদিকে জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির অনুচ্ছেদ-১ এ সকল জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে, যার আলোকে তারা অবাধে তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা নির্ধারন করবে এবং স্বাধীনভাবে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে। অনুচ্ছেদ-৩ এ প্রত্যেক অনুস্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রকে প্রত্যেকের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার উপভোগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে । চুক্তির অনুচ্ছেদ-২ এর মাধ্যমে

প্রত্যেক অনুস্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রকে[1] সকল নাগরিকের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সুরক্ষার জন্য বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সুরক্ষার অঙ্গীকার পূর্নব্যক্ত করেছে এবং বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্র[2] কে রাষ্ট্র পরিচালনার একটি অন্যতম মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। বিশেষত: সংবিধানের প্রস্তাবনায় অঙ্গীকার করা হয়েছে যে – "আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে"। বিশেষত: সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১১ তে উল্লেখ করা হয়েছে যে - "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।

দেশের সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২৭-এ বলা হয়েছে যে "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী''; পাশাপাশি অনুচ্ছেদ-২৮ (১)-এ বলা হয়েছে যে "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না'' এবং ২৮(২) -এ রাষ্ট্র ও গণজীবনের সকল স্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকারের মাধ্যমে একটি বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণের দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৩৯ এ দেশের সকল নাগরিকের চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে যা গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য।

সূতরাং এ কথা দ্বীধাহীনভাবে বলা যায় যে বাংলাদেশ গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার চর্চা ও সুরক্ষায় দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ ।

৩. বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনকালীন সময়ে বিভিন্ন মিডিয়া ও মানবাধিকার সংস্থার প্রতিবেদন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নির্বাচনকালীন বিশেষত: নির্বাচনপূর্ব, নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন পরবর্তী সময়ে মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এসব ঘটনায় সমাজের জাতিগত, ধর্মীয় ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মানুষ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় । মূলত: জাতীয় নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ন অংশ যেখানে দেশের সকল প্রাপ্তবয়স্ক/উপযুক্ত নাগরিক (ভোটার) স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার মাধ্যমে সরকার গঠন প্রক্রিয়ায় কার্যকর অবদান রাখে। এই প্রক্রিয়ায় দেশে নতুন সরকার গঠন বা

[1] বাংলাদেশ ৬ সেপ্টেম্বের ২০০০ সালে জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক চুক্তি, ১৯৬৬ অনুস্বাক্ষর করেছে।
[2] ধারা-৮: মূলনীতিসমূহ, বাংলাদেশ সংবিধান

পরিবর্তন এবং ক্ষমতার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর সম্ভব হয়। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সকল নাগরিকের সক্রিয়, সুচিন্তিত ও স্বাধীন ভোটাধিকার প্রদানের মাধ্যমেই কেবল দেশের স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য যোগ্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করা সম্ভব। যাহোক, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পদযাত্রায় সংগঠিত নির্বাচনগুলোতে (বিশেষত: ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১, ২০০৮, ২০১৪ এবং ২০১৮ সাল) সংশ্লিষ্ট সহিংসতার ধরণ বিশ্লেষণ করলে নির্বাচনপূর্ব, নির্বাচনকালীন এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ে যে সকল বিষয় বিশেষভাবে লক্ষনীয়, তা হলো:

নির্বাচন পর্যায়	সচরাচর লক্ষণীয় বিষয়
নির্বাচনপূর্ব	• জনসংযোগ কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা, • সম্ভাব্য প্রার্থীদের হুমকী ও রাজনৈতিক হয়রানি, • রাজনৈতিক মামলা দায়ের কিংবা সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দীদের এলাকা ছাড়তে বাধ্য করা • সমাজের জাতিগত, ধর্মীয় ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ প্রয়োগ । • নির্বাচনী আচরনবিধি লঙ্ঘন করে প্রচার-প্রচারনা। • সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীদের প্রতি অসৌজন্যমূলক আচরণ ও মন্তব্য করা। • নির্বাচন নিয়ে সাধারন মানুষের আশঙ্কা/আতঙ্ক
নির্বাচনকালীন	• ভোটারদের উপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরি করা • প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীর এজেন্টদের হুমকী/হয়রানী/হেনস্তা করা • প্রার্থীর সমর্থকদের উগ্র ও অসহনশীল আচরণ • প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী এবং তাদের সমর্থক/এজেন্টদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরন • সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে ভোটকেন্দ্র দখল, সহিংসতার আশ্রয় নেওয়া ও নির্বাচনী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ। • নির্বাচন সম্পর্কিত মিথ্যা গুজব রটানো এবং অনাকাঙ্খিত আতংক বা উত্তেজনা সৃষ্টি। • সমাজের জাতিগত, ধর্মীয় ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান । • অসদুপায় অবলম্বন করে নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করার প্রবণতা
নির্বাচন পরবর্তী	• নির্বাচনী ফলাফল সহজভাবে মেনে না নেয়া এবং কালিমালিপ্ত করার প্রবণতা • সহিংসতা ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি (পরাজিত প্রার্থীর অনুসারী কর্তৃক) • রাজনৈতিক প্রতিশোধ নেওয়ার মানসিকতা

	• সহিংসতা, সন্ত্রাসী হামলা ও হত্যাকান্ড সংগঠিত করার মাধ্যমে এলাকায়, বিশেষকরে জাতিগত, ধর্মীয় ও অন্যন্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। • জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর সন্ত্রাসী কার্যক্রম বিশেষত: নারী ও শিশুর উপর যৌন হয়রানী, ধর্ষণ ও সহিংসতা, বসতি ও সম্পদের ক্ষতিসাধন ও লুটতরাজ করা।

অনুরূপভাবে বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলোতে সহিংসতার পরিসংখ্যান ও ভোটার উপস্থিতি বিশ্লেষন করলে রাজনৈতিক দলগুলোর অসহনশীল ও সহিংস আচরণের একটি সাধারণ রূপ দৃশ্যমান হয় যা অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণের জন্য সহায়ক নয় (টেবিল-১) ।

টেবিল-১: বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে (১৯৯১-২০১৮) নির্বাচনী সহিংসতার মাত্রা[3]

নির্বাচনকাল	নির্বাচনী সহিংসতার চিত্র		ভোটার উপস্থিতি (%)
	খুন	আহত	
১৯৯১	৩৯	১০৯০	৫৫.৪৫%
১৯৯৬[4]	২৪	৫৬৮	৭৪.৯৬%
২০০১	১৬৩	৫০০০	৭৪.৯৭%
২০০৮	১৭	৫০০	৮৭.১৩%
২০১৪[5]	২০	১২৬৭	৩৯.৫৮%
২০১৮[6]	১৮	২০০	৪০.২০%

নির্বাচনী সহিংসতার তথ্য অনুযায়ী ২০০১ সালের নির্বাচন ছিল সবচেয়ে সহিংস ও ভয়াবহ বিশেষ করে নির্বাচন পূর্ব এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়কালে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন, ধর্ষন, বসতবাড়ীতে অগ্নি-সংযোগ, লুটতরাজ, চাদাবাজি, উচ্ছেদ ও হয়রানীর ঘটনাসমূহ ছিল অত্যন্ত অমানবিক ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। বিশেষ করে বরিশাল, বাগেরহাট, ভোলা, পিরোজপুর, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, ফেনী, গাজীপুর, ঝিনাইদহ, যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, মুন্সিগঞ্জ, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী এবং টাংগাইল জেলায়[7] এসব ঘটনার ব্যপকতা সংবাদপত্র ও বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা প্রতিবেদনে দৃশ্যমান হয়। এসব এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারী ধর্ষণ, লুটতরাজ এবং জোরপূর্বক এলাকাত্যাগে বাধ্য করার ঘটনাগুলোর বিরুদ্ধে কোন কার্যকর আইনী ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি । পরবর্তীতে এসকল ঘটনার ভয়াবহতা বিবেচনায় নিয়ে ২০০৯

[3] Jagannath University Journal of Social Sciences, Vol. 3, No. 1-2, 2015, pp. 123-135
[4] The Bhorer Kagoj, 28 May and 1 June 1996
[5] The election working group (EWG) report on 10th Parliamentary Election, January 2015
[6] The Daily Star, December 31, 2018
[7] "Post-Election Violence in Bangladesh Kills 3". The New York Times. 4 October 2001

সালে বাংলাদেশ মহামান্য হাইকোর্ট একটি নিরপেক্ষ বিচারিক তদন্তের নির্দেশ দেয় এবং নির্দেশনা অনুযায়ী তিন সদস্য বিশিষ্ট বিচারিক তদন্ত কমিটি প্রায় দুই বছর ব্যাপী তাদের তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা শেষে ২০১১ সালে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন (১১০০ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন) জমা দেয় । প্রতিবেদনটিতে ২০০১ সালের নির্বাচনকালীন[৪] মোট ২৫,০০০ সহিংস ঘটনার তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে এবং এর মধ্যে মোট ১৮,০০০ টি ঘটনা ছিল নারী ধর্ষণ বিষয়ক । এসকল ঘটনায় মোট ২৬,০০০ জনকে প্রত্যক্ষভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে যাদের মধ্যে তৎকালীন বিএনপি-জামাত সরকারের মন্ত্রী, সংসদ সদস্যসহ উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের সম্পৃক্ততার চিত্র উন্মোচিত হয়। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনযায়ী তাদের তদন্তকৃত মোট ৩৬২৫টি অভিযোগের প্রায় ৮০% এর প্রত্যক্ষ শিকার ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষকরে হিন্দু ও ক্ষুদ্র-নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সদস্য যাদের মধ্যে অনেকেই সাময়িকভাবে হলেও দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিল এবং অনেকে ভয়াবহতার ক্ষতচিহ্ন নিয়ে আজও অস্বস্তিকর জীবন-যাপন করছে। যদিও বিচারিক তদন্ত কমিটির প্রতিদেনে উল্লেখ্য ঘটনায় সরকারের প্রতি কার্যকর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা থাকলেও পরবর্তীতে তার দৃশ্যমান কোন ফলাফল লক্ষ্য করা যায়নি যা একবোরেই অনাকাঙ্ক্ষিত। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে সহিংসতার মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সাধারন ভোটারদের অংশগ্রহন বৃদ্ধি পায় যা ছিল বিগত নির্বাচনগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ (৮৭.১৩%) ভোটার উপস্থিতি। সর্বশেষ ২টি জাতীয় নির্বাচনে (২০১৪ ও ২০১৮ সাল) রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আস্থার সংকট দৃশ্যমান হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি বিশেষভাবে হ্রাস পায় (যা ছিল যথাক্রমে ৩৯.৫৮% ও ৪০.২০%)।

এরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক আস্থা, সহনশীল আচরণ এবং নাগরিকদের সুচিন্তিত ও স্বাধীন ভোটদানের পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সহনশীলতা ও মানবাধিকার সংস্কৃতি বিকাশ সম্ভব যা আগামী দিনে বাংলাদেশের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্নযাত্রা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৪. নির্দেশিকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই নির্দেশিকার মূল লক্ষ্য হচ্ছে **'নির্বাচনকালীন মানবাধিকার সুরক্ষা এবং সকলের মর্যাদাপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখা'।**

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন:

- নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী – বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রার্থী, মিডিয়া ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নির্বাচনকালীন নাগরিক অধিকার ও মানবাধিকার সুরক্ষায় সক্রিয় থাকতে উদ্বুদ্ধ করবে।
- দেশের সাধারন নাগরিক ও ভোটারদের মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার এবং সহনশীলতার সর্বোচ্চ অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করবে।

[৪] "Bangladesh gang rape convictions". *BBC News. 4 May 2011.* 4 May 2011.

- মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের অধিকার সুরক্ষা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে, এবং
- সাধারন নাগরিকদের মর্যাদাপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশন, স্থানীয় প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে মতবিনিময় করবে এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে।

৫. নির্দেশিকার অংশীজন

- বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
- নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সম্ভাব্য নির্বাচনী প্রার্থী ও স্থানীয় প্রশাসন।
- নাগরিক সংগঠন ও নাগরিক সমাজ ।
- মিডিয়া প্রতিনিধি।
- ভোটার ।
- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।
- নিবার্চন পর্যবেক্ষক দল/প্রতিনিধি/প্রতিষ্ঠান (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) ।

৬. প্রধান কার্যক্রমসমূহ

৬.১ প্রাক-নির্বাচন:

- নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক পূর্ববর্তী নির্বাচনগুলোতে সহিংসতার মাত্রার ভিত্তিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ স্থান বাছাই ও সম্ভাব্য করণীয় নির্ধারণ করা।
- নির্বাচনী দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ), সম্ভাব্য নির্বাচনী প্রার্থী এবং স্থানীয় সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে ধারাবাহিক মত-বিনিময় করা ও ঝুঁকিপূর্ণ নির্বাচনী এলাকার জন্য সম্ভাব্য করণীয় নির্ধারণ করা।
- ধারাবাহিক মত-বিনিময় সভা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে ভোটারদের নাগরিক অধিকার রক্ষায় সম্ভাব্য করনীয় সম্পর্কে নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী অংশীজন বরাবরে প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও দিক-নির্দেশনা প্রেরণ করা
- প্রাক-নির্বাচনী সময়কালে দেশের সকল নাগরিক ও ভোটারদের জন্য নাগরিক অধিকার সুরক্ষায় করণীয় সম্পর্কে তথ্য বিনিময় ও বিতরণ করা।

৬.২ নির্বাচনকালীন:

- নির্বাচনকালীন চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কমিশনের উদ্যোগে জেলা মানবাধিকার সুরক্ষা কমিটির সহযোগিতায় পরিদর্শন করা

- জরুরী উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন, স্থানীয় প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার সুরক্ষায় যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া
- কমিশন কর্তৃক মানবাধিকার সুরক্ষা বিষয়ক একটি কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষণ সেল গঠন করা এবং বিশেষ হটলাইন সুবিধা চালু করা।

৬.৩ নির্বাচন পরবর্তী:

- কমিশন কর্তৃক মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার বিষয়ে মিডিয়া মনিটরিং করা এবং নির্বাচনী সহিংস ঘটনাগুলোর ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং এর মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা।
- নির্বাচনকালীন প্রাপ্ত মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে 'মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক' একটি সমন্বিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র একইসূত্রে আবদ্ধ । শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশে স্ব-প্রণোদিত, সুচিন্তিত ও স্বাধীন ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের একজন নাগরিক শুধমাত্র সমাজে কিংবা রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশে ভূমিকা রাখে না বরং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রেও কার্যকর অবদান রাখে। এটি একটি গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেখানে একদিকে ভিন্ন দল ও মতের প্রতি মানুষের সহনশীল মনোভাব বিকশিত হয় অন্যদিকে সকলের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ নিশ্চিত হয়। একথা অনস্বীকার্য যে জনগণের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে গঠিত সরকার একদিকে যেমন জনগনের কাছে দায়বদ্ধ থেকে তার নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে দায়িত্বশীল হয় তেমনিভাবে দেশে মানবাধিকারের মানদন্ড বজায় রাখার মাধ্যমে স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত করতে কার্যকর অবদান রাখে যা মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সুশীল, সপ্রতিভ ও অগ্রবর্তী বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সংযুক্ত:

নির্বাচনকালীন মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার সুরক্ষায় নির্দেশিকার অংশীজনের দায়িত্ব ও করণীয়:

১. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নির্বাচনকালীন মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার সুরক্ষায় যেসকল বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি ও পদক্ষেপ নিতে পারেন:

নির্বাচন পর্যায়	কার্যকর পদক্ষেপ সমূহ
নির্বাচনপূর্ব	• আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে দেশের সকল নাগরিককে উৎসাহিত করা এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা। • জাতীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০০৮ কার্যকরভাবে অনুসরণ এবং নির্বাচনী এলাকায় এর যথাযথ প্রচারণা ও বাস্তবায়ন করা। • নাগরিকদের মৌলিক অধিকার চর্চা ও সুরক্ষার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে নির্বাচনকালীন সরকার, স্থানীয় প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, মিডিয়া ও নাগরিক সমাজের সাথে ধারাবাহিক আলোচনা করা এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া। • বিগত জাতীয় নির্বাচনগুলোতে নির্বাচনী এলাকার এলাকা ভিত্তিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা, সম্ভাব্য প্রার্থীদের রাজনৈতিক সহনশীলতার মাত্রা পর্যবেক্ষণ/নিরীক্ষা এবং মৌলিক নাগরিক অধিকার চর্চার স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক কার্যকর ও সমন্বিত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় তথ্য ও নির্দেশনা প্রদান করা। • নির্বাচনী এলাকায় বসবাসরত জাতিগত, ধর্মীয় ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, বিশেষকরে নারী, প্রতিবন্ধী ও বয়স্কব্যক্তিদের মধ্যে আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করা। • নির্বাচনী প্রার্থীদের ক্যাম্পেইন করার সময়কাল শেষ হওয়ার পর থেকে ভোটগ্রহন কার্যক্রম শুরু হওয়া পর্যন্ত সময়কালে এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা এবং এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান। • দুর্গম নির্বাচনী এলাকাগুলোতে বিশেষকরে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং চর ও হাওড় এলাকায় কোন প্রার্থী যাতে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে সেজন্য বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা নেয়া এবং প্রয়োজনে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার জন্য হেলিপ্যাড ও হেলিকপ্টার এবং হাওড় ও চর এলাকার জন্য যথাক্রমে স্পিডবোট ও মোটরবাইকের ব্যবস্থা রাখা।

	• আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে যাতে সকল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করা।
নির্বাচনকালীন	• নির্বাচনী এলাকা কেন্দ্রিক প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বলয় তৈরির মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের/ভোটারের জন্য সমান সুযোগ ও শান্তিপূর্ণ ভোট প্রদানের পরিবেশ নিশ্চিত করা। • নির্বাচনী এলাকায় বিশেষত: ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত 'রিয়্যাক্টিভ টিম' কে সক্রিয় রাখা যাতে করে তারা ভোটকেন্দ্রের যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা বিশেষকরে ব্যালট পেপার বা বাক্স ছিনতাই ও ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা নিয়ন্ত্রণের জন্য তাৎক্ষণিক আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। • নির্বাচন চলাকালীন প্রতিদন্দ্বী প্রার্থী ও তার সমর্থকদের যে কোন সম্ভাব্য সহিংসতা ও অসহনশীল আচরণ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে সদা সক্রিয় রাখা । • নির্বাচনী এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলোতে ভোটারদের বিশেষ করে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারদের ভোটদানের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা এবং তাদের ভোট কেন্দ্রে যাওয়া-আসার পথে যেন কোন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি তৈরি না হয় সে বিষয়ে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নির্দেশনা দেয়া । • নির্বাচন চলাকালীন বিশেষত: ভোটকেন্দ্রের ভিতরে মোবাইল ফোনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা।
নির্বাচন পরবর্তী	• নির্বাচনী ঝুঁকিপূর্ন এলাকাগুলোতে নির্বাচন পরবর্তী কমপক্ষে ৩০ দিন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সদা সতর্ক ও সক্রিয় রাখা • সকল প্রার্থী ও তার সমর্থকদের সর্বোচ্চ সহনশীলতা ও সহাবস্থানের পরিবেশ নিশ্চিত করতে স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে ধারাবাহিক আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া।

২. রাজনৈতিক দল ও সম্ভাব্য নির্বাচনী প্রার্থী

রাজনৈতিক দল ও তাদের সম্ভাব্য প্রার্থীরা নির্বাচনকালীন মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার সুরক্ষায় যেসকল বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি ও পদক্ষেপ নিতে পারেন:

নির্বাচন পর্যায়	কার্যকর পদক্ষেপ সমূহ
নির্বাচনপূর্ব	• জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের জন্য নির্বাচনী এলাকায় জনসংযোগ কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে সহনশীলতা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা। • সম্ভাব্য প্রার্থী ও তার সমর্থকদের কথাবার্তা, আচরণ ও কর্মসূচি পালনে সর্বোচ্চ সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করা। • নির্বাচনী এলাকায় বসবাসকারী জাতিগত, ধর্মীয় ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বিশেষকরে: নারী, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ভোটারদের সাথে প্রার্থী ও ভোটদান প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা সৃষ্টিতে সমন্বিতভাবে কাজ করা। • জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০০৮ কার্যকরভাবে মেনে চলা ।
নির্বাচনকালীন	• ভোটারদের জন্য ভোটদানের সহায়ক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করা। • ভোটারদের স্বাধীন ও স্বপ্রণোদিত ভোটদান কার্যক্রমের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল নির্বাচনী কর্মকর্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা। • জাতিগত, ধর্মীয় ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বিশেষ করে: নারী, প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক ভোটারদের স্বাধীন ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা। • নির্বাচনীকালীন মানবাধিকার লঙ্ঘন কিংবা নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের কোন ঘটনা সংগঠিত হলে কিংবা অভিযোগ উত্থাপিত হলে তার সুষ্ঠু তদন্ত ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।
নির্বাচন পরবর্তী	• গণ রায়ের প্রতি আস্থা ও নির্বাচনী ফলাফল মেনে নিয়ে সকলের সহনশীল ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ তৈরিতে যথাযথ দায়িত্ব পালন করা। • নির্বাচনী এলাকায় যেকোন প্রকার সহিংসতা বা উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরির (পরাজিত প্রার্থী কিংবা তার অনুসারী কর্তৃক) চেষ্টা হলে তাৎক্ষণিকভাবে শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় তা বন্ধের উদ্যোগ নেয়া এবং প্রয়োজনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহযোগিতা প্রদান করা।

৩. নাগরিক সংগঠন ও নাগরিক সমাজ:

নাগরিক সংগঠন ও নাগরিক সমাজ নির্বাচনকালীন মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার সুরক্ষায় যেসকল বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি ও পদক্ষেপ নিতে পারেন:

নির্বাচন পর্যায়	কার্যকর পদক্ষেপ সমূহ
নির্বাচনপূর্ব	• স্থানীয়ভাবে নাগরিক অধিকার ও মানবাধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরিতে অবদান রাখা। • নির্বাচন বিষয়ক আলোচনায় নাগরিক অধিকার ও মানবাধিকার সুরক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে স্থানীয় প্রেক্ষাপটে তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও পরামর্শ প্রদান করা। • স্থানীয়ভাবে সকল নাগরিক ও ভোটারদের মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার এবং সহনশীল আচরন প্রদর্শন ও অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করা। • সকলের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও নাগরিক অধিকার রক্ষায় জনমত গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করা। • যে কোন ধরনের গুজবের বিষয়ে সতর্ক থাকা। • সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত খবরে প্রভাবিত না হয়ে যাচাইপূর্বক গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহন করা।
নির্বাচনকালীন	• ভোটারদের সুচিন্তিত ও স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ করা। নাগরিক অধিকার কিংবা মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোন ঘটনা ঘটলে তা তাৎক্ষনিকভাবে স্থানীয় প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এর প্রয়োজেনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে অবহিত করা। • স্থানীয়ভাবে নির্বাচন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসন কিংবা নির্বাচন কমিশন বরাবরে তাদের সুচিন্তিত, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন মতামত/সুপারিশ প্রদান করা। • যে কোন ধরনের গুজবের বিষয়ে সতর্ক থাকা। • সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত খবরে প্রভাবিত না হয়ে যাচাইপূর্বক গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহন করা।
নির্বাচন পরবর্তী	• নির্বাচনী এলাকায় সকল রাজনৈতিক দলীয় প্রার্থী ও তাদের অনুসারীদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ নিশ্চিত করতে স্থানীয় প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও স্থানীয় সংগঠনগুলোর সাথে যোগাযোগ, তথ্য বিনিময় ও সমন্বয় রক্ষা করা। • জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় বিশেষ নজরদারীর ব্যবস্থা করা, তথ্য সংগ্রহ করা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহন করা। • যে কোন ধরনের গুজবের বিষয়ে সতর্ক থাকা। • সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত খবরে প্রভাবিত না হয়ে যাচাইপূর্বক গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহন করা।

	• ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাভিত্তিক সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি গঠন এবং স্থানীয় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য সক্রিয় রাখা।

৪. মিডিয়া/গণমাধ্যম প্রতিনিধি:

মিডিয়া/গণমাধ্যম প্রতিনিধি নির্বাচনকালীন মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার সুক্ষায় যেসকল বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি ও পদক্ষেপ নিতে পারেন:

নির্বাচন পর্যায়	কার্যকর পদক্ষেপ সমূহ
নির্বাচনপূর্ব	• নির্বাচনী এলাকা, প্রার্থী, ভোটার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ/সম্প্রচার করা। • নির্বাচনী এলাকার ঝুকিপূর্ণ স্থান সম্পর্কে স্থানীয় প্রশাসন, নির্বাচনী কর্মকর্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করা। • নির্বাচন প্রক্রিয়া ও ভোটাধিকার সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতন করা।
নির্বাচনকালীন	• সঠিক ও তথ্যনির্ভর সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার/প্রচারণার ব্যবস্থা করা। • অনুমান নির্ভর, বিদ্বেষমূলক, পক্ষপাতদুষ্ট বা স্থানীয় স্পর্শকাতর বিষয়ে সংবাদ প্রচার/প্রচারণা থেকে বিরত থাকা।
নির্বাচন পরবর্তী	• নির্বাচনী এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি সম্পর্কিত তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ করা এবং তা প্রচার করা। • উদ্ভূত মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক যে কোন ঘটনার সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা এবং যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য স্থানীয় প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে অবহিত করা।

৫. স্থানীয় প্রশাসন:

স্থানীয় প্রশাসন নির্বাচনকালীন মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার সুরক্ষায় যেসকল বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি ও পদক্ষেপ নিতে পারেন:

নির্বাচন পর্যায়	কার্যকর পদক্ষেপ সমূহ
নির্বাচনপূর্ব	• এলাকার নির্বাচন পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণ ও বাস্তব ভিত্তিক মূল্যায়ন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে অবহিত করা। • জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটি' এর নিয়মিত সভায় নির্বাচনকেন্দ্রিক মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবেলায় সমন্বিত ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহন করা।

	• নির্বাচনে ঝুকিপূর্ন এলাকা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং আইন-শৃংঙ্খলা বাহিনীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া। • জাতীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০০৮ এর যথাযথ বাস্তবায়নে নির্বাচন কমিশনকে কার্যকর সহযোগিতা করা।
নির্বাচনকালীন	• জেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, মিডিয়া ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে ধারাবহিক যোগাযোগ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে নির্বাচনের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা। • ঝুঁকিপূর্ণ নির্বাচনী কেন্দ্রগুলোতে 'ভিজিলেন্স টিম'কে সদা সতর্ক ও সক্রিয় রাখা যাতে করে তারা যেকোন সহিংস ও ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরির অপচেষ্ঠা তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিরোধ করতে পারে।
নির্বাচন পরবর্তী	• নির্বাচন পরিবর্তী কমপক্ষে এক মাস পর্যন্ত জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ রাখতে 'ভিজিলেন্স টিম' অথবা 'র‍্যাপিড রেসপন্স টীম' কে কার্যকর রাখা। • জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় 'ভিজিলেন্স টিম' এর মাধমে বিশেষ নজরদারীর ব্যবস্থা করা যাতে করে সেখানে কোন ধরনের সহিংসতা, হয়রানী কিংবা ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়। • যেকোন প্রকারের প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় যথাযথ দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর থাকা।

৬. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী:

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নির্বাচনকালীন মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার সুরক্ষায় যেসকল বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি ও পদক্ষেপ নিতে পারেন:

নির্বাচন পর্যায়	কার্যকর পদক্ষেপ সমূহ
নির্বাচনপূর্ব	• নির্বাচনী এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক বিশেষ নজরদারীর ব্যবস্থা করা। • নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থী ও তার সমর্থকদের কর্মকান্ড পর্যক্ষেণ করা এবং যে কোন সহিংস ঘটনায় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহন করা। • নির্বাচনী এলাকার সার্বিক জন নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং শান্তিপূর্ণ ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখা। • নির্বাচনী আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় (জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, দৃঢ়তা ও নিরপেক্ষ আচরণ দৃশ্যমান করা। • স্থানীয় প্রশাসন ও নির্বাচনী কর্তৃপক্ষের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা।

নির্বাচনকালীন	• জন-নিরাপত্তা, বিশেষকরে ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেয়া। • জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহন করা। • যেকোন ধরনের সহিংসতা ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সদা প্রস্তুত থাকা।
নির্বাচন পরবর্তী	• জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা। • যে কোন সহিংস কার্যক্রম কিংবা উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরির ঘটনায় তাৎক্ষণিক তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা গ্রহন করা।

৭. নিবার্চন পর্যবেক্ষক দল/প্রতিনিধি/প্রতিষ্ঠান (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক):

নিবার্চন পর্যবেক্ষক দল/প্রতিনিধি/প্রতিষ্ঠান (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) নির্বাচনকালীন মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার সুরক্ষায় যেসকল বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি ও পদক্ষেপ নিতে পারেন:

নির্বাচন পর্যায়	কার্যকর পদক্ষেপ সমূহ
নির্বাচনপূর্ব	• সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি বা ঘাটতি থাকলে সে সম্পর্কে যথাযথ ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা । • নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা বিশেষত: নির্বাচনী উপকরণ, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা এবং সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্ব-প্রস্তুতি সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করা। • পর্যবেক্ষকদের সক্রিয় উপস্থিতির মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা সম্পর্কে ভোটারদের আগ্রহ ও আস্থা অর্জন করা।
নির্বাচনকালীন	• নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা, ২০১৭' এর আলোকে স্থানীয় পর্যবেক্ষকগণ (ধারা-১১) এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার পর্যবেক্ষকগণ (ধারা-১২) তাদের জন্য সুর্নিদিষ্ট আচরনবিধি (ধারা-১৪) যথাযথভাবে মেনে চলা।
নির্বাচন পরবর্তী	• সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার গুণগত মান ও যথার্থতা সম্পর্কে এবং নির্বাচনী ফলাফলের সঠিকতা সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপন ও কমিশন বরাবরে প্রেরণ করা।

৮. ভোটার :

ভোটারগন নির্বাচনকালীন মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার সুরক্ষায় যেসকল বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি ও পদক্ষেপ নিতে পারেন:

নির্বাচনকালীন সময়	কার্যকর পদক্ষেপ সমূহ
নির্বাচনপূর্ব	• জাতীয় পরিচয় পত্র, ভোটার নম্বর, ভোট কেন্দ্র এবং ভোটদান পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা । • নিজস্ব পর্যালোচনার মাধ্যমে সঠিক ও যোগ্য প্রার্থী বাছাই করা ও স্বপ্রণোদিত ভোটদানের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করা।
নির্বাচনকালীন	• স্বপ্রণোদিত ও স্বাধীনভাবে নিজের ভোট নিজে দেয়া ও পরিবারের অন্যান্যদের ভোটদানে উৎসাহিত করা। • পরিবারে যদি কোন বয়স্ক, প্রতিবন্ধী বা অক্ষম সদস্য থাকেন তবে তাদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা নেয়া। • কোন ধরনের জাল ভোট কিংবা ভোটদানের জন্য প্রতারণার আশ্রয় না নেয়া।
নির্বাচন পরবর্তী	• সকলের সাথে এলাকায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখা। • যেকোন ধরনের অসৌজন্যমূলক/উগ্র/অসহনশীল আচরণ ও মন্তব্য থেকে বিরত থাকা। • এলাকায় কোন সহিংসতা ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় প্রশাসন ও নিকটস্থ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করা। • জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর কোন সহিংসতা কিংবা মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোন ঘটনা সংগঠিত হলে তা দ্রুত স্থানীয় প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে অবহিত করা। • কোন প্রকারের গুজব ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কোন রটনা হতে প্রভাবিত না হওয়া বা উত্তেজনা সৃষ্টির প্রবণতা হতে বিরত থাকা।

সমাপ্ত

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯, কারওয়ান বাজার, ঢাকা- ১২১৫
পিএবিএক্স: ০২-৫৫০১৩৭২৬-২৮
e-mail : info@nhrc.org.bd
Website : www.nhrc.org.bd

হেল্পলাইন: ১৬১০৮